BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/02100015

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 2| Issue: 10| November 2024| e-ISSN: 2584-1890

রবীন্দ্র উপন্যাসের নাট্যরূপায়ন

অনুশ্রী মাইতি দাস

Research Scholar, Department of Bengali, RKDF University, Ranchi. Email id- anusripatra1990@gmail.com

Abstract:

উপন্যাস ও নাটক সাহিত্যের দুটি স্বতন্ত্র আঙ্গিকের শিল্পমাধ্যম হলেও প্রতিভাধর ঔপন্যাসিক কখনো উপন্যাসের নাট্যরূপায়ন করে থাকেন। পারিবারিক সূত্রে একটি অসাধারন নাট্যমন লাভ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ নাট্যচর্চা ছিল তাঁর নিত্যদিনের কাজ। তাঁর স্বরচিত মোট ৫ টি উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করেছিলেন মূলতঃ মঞ্চাভিনয়ের বিষয়টি মাথায় রেখে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তিনি গল্পের প্লট ও চরিত্রের দিক থেকেও সন্তুষ্ট ছিলেন না। ফলে প্রয়োজন অনুযায়ী কাহিনী রূপান্তর করেছেন ও চরিত্রের গতিবিধির বদল ঘটিয়েছেন একবার রূপান্তরের পর বিভিন্ন সংস্করণে বারেবারে পরিবর্তন করেছেন।

সূচকশব্দ: *রবীন্দ্র উপন্যাস, রবীন্দ্র নাট্য, উপন্যাসের নাট্যরূপান্তর।*

Introduction:

সাহিত্য-রাজনীতি-ধর্ম-দর্শন এসব নানাবিধ প্রপঞ্চ পারিবারিকভাবেই সঞ্চয়ন ঘটে রবীন্দ্রমননে। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো নাটক রচনায়ও রবীন্দ্রনাথ পারঙ্গমতার পরিচয় দেন। নিজের রচিত নাটকে অভিনয় করে অসাধারণ কৃতিত্বের দাবিদারও তিনি। অভিনয় শিল্প সম্পর্কে তার অভিনিবেশ, চর্চা ও অনুশীলন প্রকারান্তরে তার সৃষ্টিকেই সমৃদ্ধ করেছিল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের অনেক সদস্য অভিনয়ের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। মূলত পারিবারিক নাট্য ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথকে নাট্যাভিনয়ে উৎসাহ জোগায়।রবীন্দ্রনাথের সময়পর্বে বাঙলার নাটকের ইতিহাস মাত্র তিরিশ বছরের। তৎকালীন নাটকের ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায়, ১৭৯৫ সালে গেরাসিম লেবেদেভ নামে জনৈক রুশ দেশীয় আগন্তুক কোলকাতায় 'বেঙ্গল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন। এই রঙ্গমঞ্চে 'The Disguise', 'Love is the best Doctor' সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। বাঙলায় অনূদিত এ দুটি নাটকের মাধ্যমে লেভেদেভের নাম বাঙলায় ছড়িয়ে পড়ে। এরপর প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের আগ্রহে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'হিন্দু থিয়েটার'। প্রকৃতপে ১৮৩৫ সালে নবীনচন্দ্র সেনের বাড়িতে 'বিদ্যাসুন্দর'-এর অভিনয়ের পর থেকে বাঙলা নাটকের সূচনা বলে মনে করেন অনেকে। তবে বাঙলা নাটকের উন্মেষপর্বে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কালিপ্রসন্ন সিংহ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, তারাচরণ শিকদার, হরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ নাট্যকারের অবদান অনস্বীকার্য। আবার বাঙলা নাটকের বিকাশপর্বে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের নামও স্মরণীয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত পাশ্চাত্য আদলে নাটক রচনা করেন। বাঙলা নাটকের পরিণতিপর্বে ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপন ও গিরিশ চন্দ্র ঘোষের বাঙলা নাট্যমঞ্চে আবির্ভাব সমসাময়িক ঘটনা হলেও গিরিশচন্দ্র ঘোষকে প্রথমদিকে মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে অভিনয় করতে হয়। এ সময় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কিছু উপন্যাসের নাট্যরূপ

দেয়া হয়। বাঙলা নাটকের পরিণতি পর্বে পেশাদার নাট্যগোষ্ঠীর আবির্ভাবেও সৌখিন নাট্যচর্চা থেমে থাকেনি বরং পেশাদার নাট্যগোষ্ঠী তৎকালীন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত চিত্তের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়। ফলে ঠাকুরবাড়ির শখের থিয়েটার চর্চা যেমন বন্ধ হয়নি তেমনি, ঠাকুর পরিবারের থিয়েটার-চাহিদা ও অভিনয়ে প্রশংসারও ঘাটতি পড়েনি। তৎকালীন বিভিন্ন পেশাদার নাট্য সংগঠনের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকদের সান্ধ্যবিনোদনের কেন্দ্র হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে ১২৯৯ বঙ্গাব্দে 'সঙ্গীত সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্গীত সমাজের উদ্যোগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক অভিনীত হলেও রবীন্দ্রনাথ সংগঠনটির সঙ্গে জন্মলগ্ন থেকে জড়িত ছিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এই সময়ের অভিনীত নাটকের অধিকাংশ নায়ক-নায়িকার উচ্চারণ, বাচনভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি ভালো ছিল না। এসব দেখার দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের ওপর বর্তেছিল।' কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, গীতিকবিতা ইত্যাদি রচনার ভেতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য নাটক রচনা করেন। নাটক যতরকম হতে পারে, রবীন্দ্রনাথ তার সবগুলো নিয়েই নিরীক্ষা করেছেন। গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, গীতিকাব্য, হেঁয়ালি নাট্য, একক নাট্য, নাটিকা, গদ্য-নাটক, প্রহসন ছিল রবীন্দ্র নিরীক্ষার বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ কেন নাটক রচনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন- প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া গেলে রবীন্দ্রনাথের যুগরুচি ও আধুনিকতা নিয়ে তার অবস্থান নির্ণয় সম্ভব। নাটকের মাধ্যমে তিনি তৎকালীন সমাজব্যবস্থার বাস্তবতা যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রবেশ ঘটিয়েছেন বাঙলা সাহিত্যে। নাটকগুলিতে কৌতুক ও সঙ্কেতের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বার্তা পৌঁছে দিতে সচেষ্ট থেকেছেন। ঐতিহাসিক, পৌরাণিক উপাদান-উপকরণ প্রয়োগ এবং সাঙ্গীতিক বাণীভঙ্গির আশ্রয়ে তত্ত্ব প্রচার করেছেন। মৌলিক নাটকের মধ্যে জীবনাচার ও নানামুখী সামাজিক বৈষম্য ও এসবের ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন, তেমন মঞ্চাভিনয়ের চাহিদা মেনে কিছু উপন্যাসেরও নাট্যরূপান্তর ঘটিয়েছেন

Discussion:

যে পাঁচটি উপন্যাসের স্বহস্তে নাট্যরূপায়ন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, নিম্নে তার তালিকা দেওয়া হল-

উপন্যাস	**রূপান্তরিত নাট্যরূপ**
রাজর্ষি (১৮৮৭)	বিসর্জন (১৮৯০)
বউ ঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩)	প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯)
প্রজাপতি নির্বন্ধ (১৯০৮)	চিরকুমার সভা (১৯২৬)
মালঞ্চ (১৯৩৪)	মালঞ্চ (১৯৬৮)
যোগাযোগ (১৯২৯)	যোগাযোগ (১৯৩৬)

রাজর্ষি (১৮৮৭) : বিসর্জন (১৮৯০)

'রাজর্ষি' উপন্যাস রচনার পিছনে এক অদ্ভুত কাহিনী আছে, কবি নিজেই জানিয়েছেন রচনার সেই ইতিহাস। 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি লিখছেন- "দুই এক সংখ্যা 'বালক' বাহির হইবার পর দুই একদিনের জন্য দেওঘরে যাই। কলিকাতা ফিরিবার সময় রাত্রে গাড়িতে ভিড় ছিল, ভাল করিয়া ঘুম হইতেছিল না, ঠিক চোখের উপর আলো জ্বলিতেছিল। মনে করিলাম ঘুম যখন হইবেই না তখন এই সুযোগে বালকের জন্য একটা গল্প ভাবিয়া রাখি। গল্প ভাবিবার ব্যর্থ চেষ্টার টানে গল্প আসিল না। ঘুম আসিয়া পড়িল।

স্বপ্ন দেখিলাম কোন এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্ত চিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে- "বাবা, এ কি! এ যে রক্ত!" বালিকার এই কাতরতায় তাহার রাগ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথছ বাহিরে রাগের ভান করিয়া কোনমতে তাহার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে।- জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প। এমন স্বপ্নে পাওয়া গল্প এবং অন্য লেখা আমার আরো আছে। এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের ইতিহাস মিশাইয়া রাজর্ষি গল্প মাসে মাসে লিখিতে লিখিতে 'বালক'এ বাহির করিতে লাগিলাম।"[১]

'রাজর্ষি' উপন্যাসের কাহিনীর প্রথম থেকে আঠারো পরিচ্ছেদ পর্যন্ত গল্প নিয়ে 'বিসর্জন' নাটক লেখা হয়েছে। ৩২, ৩৩, ৩৬ ও ৩৭ পরিচ্ছদ থেকে নক্ষত্র রায়ের বিদ্রোহের প্রসঙ্গ এসেছে নাটকে। উপন্যাসের বেশ কিছু চরিত্র বাদ দিয়েছেন তিনি। বিসর্জনের রচনাকালীন পটভূমি বিষয়ে একটি ছবি পাওয়া যায় এর উৎসর্গ অংশে। সেখানে করি, 'শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাণাধিকেষু' উদ্দেশ্য করে লিখেছেন একটি দীর্ঘ কবিতা-

"তোরি হাতে বাঁধা খাতা / তারি শ-খানেক পাতা / অক্ষরেতে ফেলিয়াছি ঢেকে / মস্তিষ্ককোটরবাসী / চিন্তাকীট রাশি রাশি / পদচিহ্ন গেছে যেন রেখে..."।

এই খাতা এবং তাঁর লেখা নিয়ে কবি যে রহস্য রেখেছেন তার উন্মোচন করেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'ঘরোয়া'তে তিনি লিখছেন-

"... রবিকাকা আছেন পরগণায়। দাদা, অরুদা আমরা কয়েকজনে একটা কী নাটক হয়ে গেছে আর একটা নাটক করব তার আয়োজন করছি। 'বউঠাকুরানীর হাট'-এর বর্ণনাগুলি বাদ দিয়ে কেবল কথাগুলি নিয়ে খাড়া করে তুলেছি নাটক করব। ঝুপঝুপ বৃষ্টি পড়ছে আমরা সব তাকিয়া বুকে নিয়ে এই সব ঠিক করছি। এমন সময় রবিকাকা কী একটা কাজে ফিরে এসেছেন। তিনি বললেন দেখি কী হচ্ছে! খাতাটা নিয়ে নিলেন, দেখে বললেন, না, এ চলবে না --- আমি নিয়ে যাচ্ছি খাতাটা, শিলাইদহে বসে লিখে আনব, তোমরা এখন আর কিছু করো না। ... এর কিছু দিন বাদেই রবিকাকা শিলাইদহে গেলেন আট দশ দিন বাদে ফিরে এলেন, বিসর্জন নাটক তৈরি।"[২]

এখানে একটু তথ্যগত বিভ্রান্তি আছে, অবনীন্দ্রনাথের মুখে বলা এই স্মৃতি কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন রাণী চন্দ। পরে অবশ্য পুলিনবিহারী সেনের একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী রাণী চন্দ অবনীন্দ্রনাথ কোন গ্রন্থের নাম বলেছিলেন তা সঠিক করে বলতে পারেননি। ১৮৯০ সালে মূলত বাড়িতে অভিনয় হবে এমন উদ্দেশ্যেই এই নাটক লেখা হয়। 'বিসর্জন' প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯৭ বঙ্গাব্দে (১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ), আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস থেকে। প্রথম প্রকাশের পরে ১৩০৩ সালে 'কাব্যগ্রন্থাবলী'তে এই নাটক দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হয়, কিন্তু এই প্রকাশে প্রথম সংস্করণ থেকে অনেকটাই বদলে যায়। কার্যত একে দ্বিতীয় সংস্করন বলা যায়। এরপর আবার ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১ আষাঢ় আলাদা বই আকারে আরো কিছুটা পরিবর্তন করে 'দ্বিতীয় সংস্করণ' নাম দিয়ে এই নাটকের পরবর্তী প্রকাশ হয়। কিন্তু আদতে এটি তৃতীয় সংস্করণ। অবাক করার মত বিষয় হল এরপরে রবীন্দ্র গ্রন্থাবলি যেটি হিতবাদী প্রকাশ করেছিল ১৩১১ বঙ্গাব্দে, সেখানে এল ১৩০৬ এর সংস্করণ অনুসারে দৃশ্যবিভাগ। ১৩২৩ সালে বিসর্জনের একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় কিন্তু সেটি আবার ১৩১০ এর পুনর্মুদ্রন। এরপরে কাব্যগ্রন্থাবলিতে যেটি প্রকাশ পেয়েছিল তার অনেক পরিবর্তন করে তৃতীয় সংস্করণ নামে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত হয় এই নাটক। এই সংস্করণের সম্পাদনা করেছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। তিনি এখানে ফিরিয়ে আনেন প্রথম সংস্করণের অনেক উপাদান এবং অবশ্যই বেশ কিছু নতুন অংশ। পাঠ পরিচয় অংশে তিনি এই সংস্করণ সম্পর্কে লিখছেন –

"গত ৩০ বৎসরের মধ্যে কোনো সংস্করণ না হওয়ায় বিসর্জনের পাঠ অনেক জায়গায় অশুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। বর্তমান সংস্করণের পাঠ ১২৯৭ সালের প্রথম সংস্করণ, ১৩০৩ সালের সংগৃহীত সংস্করণ ও ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের শোভন সংস্করণের সহিত

মিলাইয়া প্রস্তুত করা হইল। বর্তমান সংস্করনে প্রথম সংস্করণের অনেকগুলি পরিত্যাক্ত অংশ পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে, এবং ১৩৩০ সালে সম্পূর্ণ নূতন একটি অংশ যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই জন্য বর্তমান সংস্করণে কবি অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ সম্পূর্ণ নতুন করিয়া সাজাইয়াছেন। বর্তমান সংস্করণটিকে সত্য সত্যই একটি সম্পূর্ণ নূতন সংস্করণ, এবং বর্তমান পাঠ (ছাপার ভুল বাদ দিয়া) মোটামুটি প্রামাণ্য বলিয়া ধরা যেতে পারে।"[৩]

তবুও এটাই প্রচলিত সংস্করণ নয়, তার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে আরো ৫ বছর, ১৩৩৮ এ প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণটিই প্রচলিত পাঠ। যা আবার ১৩১০ এর সংস্করণ। এই পুরাতন রূপকে ফিরিয়ে আনা সকলে সমর্থন করেননি। ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ তারিখে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য কবিকে একটি পত্র লেখেন, তিনি জানান "বাংলা সাহিত্যের এই নাটকখানিকে বিকলাঙ্গ দেখতে ইচ্ছে করে না।" সেই পত্রের কিছুটা অংশ উল্লেখ করা হল-

"আমার মতে শ্রীমান প্রশান্ত মহলানবিশ ১৩৩৩ সালে বিশ্বভারতী থেকে যে সংস্করণ বের করেছিলেন সেইটিই সর্বোত্তম, তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংক্ষিপ্ত সংস্করণগুলির সৌন্দর্য ও নাটকত্বের হানি হয়েছে... আর তাছাড়া হাসি ও তাতাকে বাদ দেওয়া যায় না, কিন্তু তারা সংক্ষিপ্ত সংস্করণে বাদ পড়েছে... পদে পদে অনেকগুলি Dramatic Irony নষ্ট হয়ে গেছে। তাতে ক'রে বইখানির সৌন্দর্যহানি হয়েছে বলে মনে করি।"[৪]

বউ ঠাকুরানীর হাট (১৮৮৩) : প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯)

'বউ ঠাকুরানীর হাট' গ্রন্থ হিসাবে প্রথম প্রকাশিত হয় ১১ জানুয়ারি ১৮৮৩ সালে। এর আগে ভারতী পত্রিকায় কার্তিক ১২৮৮ থেকে আশ্বিন ১২৮৯ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে বেরিয়েছিল। এই উপন্যাসের কাহিনী উৎস হিসাবে কবি একবার মন্তব্য করেছিলেন-

"সন্ধ্যাসঙ্গীতে গোধুলির মতো একটা অস্পষ্টতা আগ ছায়া অর্থ প্রস্ফুট ভাষা বীজের অঙ্কুরের মতো। বউ ঠাকুরানীর হাটেরও বোধ হয় কতকটা সেইরকম। বোধ হয় ব্রজসুন্দর মিত্রের 'বাকলা চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস' নামে একটা চটি বই হইতে একটু বীজ নেওয়া। নামটাই আমাকে মুগ্ধ করিয়া তাগিদ করিল।"[৫]

আবার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রজীবনী' প্রথম খন্ডে লিখেছেন- "রবীন্দ্রনাথ যে গ্রন্থ হইতে তাঁহার প্রেরণা পান সেটি হইতেছে প্রতাপচন্দ্র ঘোষ কৃত 'বগাধিপ পরাজয়' (১৮৬৯)। বঙ্গাধিপের কতকগুলি চরিত্র রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মধ্যে নূতন রূপ লইয়াছে।"[৬]

এই উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রকাশিত হয় ১৩১৬ বঙ্গাব্দে, নাম ছিল 'ঐতিহাসিক নাটক'। নাটকটির বিজ্ঞাপন অংশে কবি লিখেছেন- "বউ ঠাকুরানির হাট নামক উপন্যাস হইতে এই প্রায়শ্চিত্ত গ্রন্থখানি নাট্যীকৃত হইল। মূল উপন্যাসখানির অনেক পরিবর্তন হওয়াতে এই নাটকটি প্রায় নতুন গ্রন্থের মতো হইয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে কবি আবার এই 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের বহু দিক পরিবর্তন করে ভিন্ন এক নাট্যরূপ প্রকাশ করেন তার নাম ছিল 'পরিত্রান'।

প্রজাপতির নির্বন্ধ (১৯০৮) : চিরকুমার সভা (১৯২৬)

১৩৩২ বঙ্গাব্দের ২৯ চৈত্র 'চিরকুমার সভা' প্রকাশিত হয়, প্রকাশ করেন করুণাসিন্ধু বিশ্বাস। কিন্তু ভিন্ন রূপে হলেও একই নামে এই রচনা প্রথমে ভারতী পত্রিকায় ১৩০৭ বৈশাখ থেকে ১৩০৮ জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে ধারাবাহিক ভাবে বেরিয়েছিল। এটি প্রকাশের সময় কবি লেখাটির বিষয়ে বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে একাধিক পত্র লিখেছিলেন। বিশ্বভারতী প্রকাশিত চিঠিপত্র ৮- এ সেই পত্রগুলি সংকলিত হয়েছে। কয়েকটি পত্রের উল্লেখ করা হল। ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ২৪ শ্রাবণ কবি লিখছেন-

"প্রভাতকুমারের কাছ থেকে আশ্বিনের চিরকুমার সভার তাগিদ এসেছে - ভাদ্রেরটা পাঠিয়ে দিয়েছি।"[৭]

১৯০১ সালের মার্চ মাসের একটি পত্রে তিনি লিখছেন-

"চিরকুমার সভার শেষ দিকটায় একেবারে full steam লাগানো গিয়েছিল। ক্রমাগত তাড়া খেয়ে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলুম—যেমন করে হোক শেষ করে দিয়ে অপণী হবার জন্যে মনটা নিতান্তই ব্যাকুল উঠেছিল। তার পরে তোমার কাছে শুনলুম শেষ দিকটা ক্রমেই তিলে হয়ে আসছে তখন কলমের পশ্চাতে খুব একটা কড়া চাবুক লাগিয়ে একদমে শেষ করে দেওয়া গেছে।"[৮]

প্রিয়নাথ সেনের পরামর্শ অনুসারে তিনি পরিবর্তনের চেষ্টা করবেন, এমনকি তার নিজের দেখার অন্বয় নিয়েও তিনি চিন্তিত। তাই এই পত্রের শেষে কবি লিখছেন-

"যেখানে থামা উচিত এবং যেরকম ভাবে থামা উচিত তা হয়েছে কি না নিজে বুঝতে পারছি নে। একবার সমস্ত জিনিষটা একসঙ্গে ধরে দেখতে পারলে তবে এর পরিমাণ সামঞ্জস্য বিচার করা যায় --- সেইজন্যে বৈশাখের ভারতীর অপেক্ষায় আছি। যখন বই বেরবে তখন অনেকটা বদল হয়ে বেরবে।"[৯]

পত্রিকার এই পাঠ "চিরকুমার সভা' নামে ১৩১১ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্র গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। এরপর এই লেখা 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' নামে প্রকাশিত হয় ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ১৪ ফাল্গুন (২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮)। আগে প্রকাশিত চিরকুমার সভার কিছু কিছু সংলাপ বাদ দিয়া আবার কিছু সংলাপ যুক্ত করে করি তৈরি করেছিলেন 'প্রজাপতি নির্বন্ধ'। তবে ভারতী পত্রিকা ও গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত উপন্যাসের পরিচ্ছেদ সংখ্যা ছিল ১৫ টি, বইএর ক্ষেত্রে সেটি হয়েছে ১৬। স্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য পরিবর্তিত এই 'প্রজাপতি নির্বন্ধ'র সংলাপের অংশকে প্রধান করে এর নাট্যরূপ 'চিরকুমার সভা' প্রকাশিত হয়েছিল (১৩৩২)।

মালঞ্চ (১৯৩৪) : মালঞ্চ (১৯৬৮)

মালঞ্চ' উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ৩ এপ্রিল। এর আগে এটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হত বিচিত্রা পত্রিকায় ১৩৪০ এর আশ্বিন কার্তিক অগ্রহায়ন সংখ্যায়। কবির এই উপন্যাস রচনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমরা পাই সুধীরচন্দ্র করের 'কবিকথা' গ্রন্থে-

"খড়দার গঙ্গার উপর এক বড় দোতালা বাড়ি, কবি সেখানে পুজোর সময় কাটাচ্ছিলেন। বৌমা প্রতিমা দেবী ও নাতনী পুপে কবির সঙ্গে ছিলেন; লেখককে কবির সঙ্গে সেবার কাটাতে হয়েছিল। এই সময়টাতেই মালঞ্চ বইখানির অধিকাংশ লিখিত ও সংশোধিত হয়।"[১০]

আবার ১৯৩৩ সালের ১৪ মার্চ কবির নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা একটি পত্রে জানা যায় এই রচনা সম্পূর্ন করতে আরও কিছু সময় লেগেছিল। কবির এই উপন্যাস লেখা শেষ হয় আরও কিছুদিন পরে। ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মে মাসে তিনি মৈত্রেয়ী দেবী প্রমুখদের এই গ্রন্থ পাঠ করে শুনিয়েছিলেন তার বিবরণ পাওয়া যায়-

"সেদিন বোধহয় ১৯৩৩ সালের গ্রীষ্মকাল। দার্জিলিংএ গ্লেনইডেন নামে একটি বাড়িতে গুরুদের অবকাশ যাপনে এসেছেন। মালঞ্চ গল্পটি তখন সদ্য রচনা শেষ হয়েছে। একদিন তাই দার্জিলিংএ উপস্থিত বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ এল গল্প শোনাবার। কবি পড়ে শোনালেন মালঞ্চ। বাঁশরি ও মান দুটি গল্পই দেবার দার্জিলিংএ লেখা হয়।"[১১]

এই উপন্যাসের একটি নাট্যরূপ নিয়েছিলেন কবি, সেটি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ছিল। কিন্তু এই নাট্যরূপটি প্রকাশের ইচ্ছে কবির ছিল, ১ ভাদ্র ১৩৪০ তারিখে নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লেখা একটি চিঠি থেকে আমাদের তেমনটাই মনে হয়-

"তারপর মালঞ্চের নাট্যকরণে কোমর বাঁধতে হল। কারণ কোমরের প্রতিবেশী জঠরের তাগিদ ছিল। অথচ অভিনয় হতে পারবে বলে আশা নেই।"[১২]

কিন্তু এই নাটক অভিনয়ের একটা সম্ভাবনার কথা সুধীরচন্দ্র কর তাঁর আত্মকথায় জানিয়েছেন-

"মালঞ্চ উপন্যাসখানি নাট্যাকারে পরিবর্তিত করে শান্তিনিকেতনে একবার অভিনয় করবার কথা হয়। এমনিতেই সমস্তটা বই কথা বার্তায় ভরানো। অধ্যায়গুলোকে দৃশ্য করে বর্ননার অংশগুলোকে প্রযোজনার নির্দেশের মধ্যে ভরে দেওয়া গেল। কথাবার্তার অংশ প্রায় যথাযথই রইল। এমনি করে তিন-চার এক্সারসাইজ বুক-এ মালঞ্চ'র নাট্যরূপ দাঁড়করানো হল। কিন্তু সেটি শেষপর্যন্ত আর অভিনীত হয়নি।"[১৩]

কবির মৃত্যুর পর ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে 'রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা' প্রথম খণ্ডে এই নাটকটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কবির মৃত্যুর পরে, ১৩৮৬ বঙ্গাদের আষাঢ় মাসে, প্রকাশ করেন বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের পক্ষে রণজিৎ রায়।

যোগাযোগ (১৯২৯) : যোগাযোগ (১৯৩৬)

'যোগাযোগ' উপন্যাসটি ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থপ্রকাশের আগে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৩৩৪ আশ্বিন সংখ্যা থেকে চৈত্র ১৩৩৫ পর্যন্ত এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৩৪ এর ভাদ্র সংখ্যায় জানানো হয়েছিল- 'আশ্বিন মাস হইতে রবীন্দ্রনাথের নতুন উপন্যাস আরম্ভ হইবে।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রথম দুই সংখ্যায় এর নাম ছিল 'দুইপুরুষ'। পরে তিনি এর নাম বদল করেন। কেন এই নাম পরিবর্তন, তার কারণ হিসাবে সজনীকান্ত দাস জানিয়েছেন- জলধর সেনের এই একই নামে উপন্যাস আছে বলে তিনি এই নামের পরিবর্তন ঘটান। ১৯২৯ সালে প্রকাশিত যোগাযোগ উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রথমে প্রকাশিত হয় 'রবীন্দ্র বীক্ষা' পত্রিকায় পৌষ ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে। পরে আলাদা বই আকারে শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিকের সম্পাদনায় বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে প্রকাশিত হয় ১৪০২ এর পৌষ মাসে। রবীন্দ্রনাথ এই নাট্যরূপ দিয়েছিলেন শিশির কুমার ভাদুড়ীর অনুরোধে। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে একটি চিঠিতে (তারিখহীন) তিনি লিখেছিলেন-

"শিশির ভাদুড়ী যোগাযোগের নাট্যকরণ সম্বন্ধে দিয়ে পড়ে ছিলেন। খানিকটা অংশ পূর্বেই করে দিয়েছিলুম। বাকি অনেকখানিই তিন চারদিনের মধ্যে লিখে দেবার জন্যে তার আবেদন। দুঃসাধ্য কাজ করতে হয়েছে, এমন একটানা পরিশ্রম আর কখনো করিনি। আমার নিজের বিশ্বাস জিনিসটি ভালোই হয়েছে। উপযুক্ত অভিনেতা সংগ্রহ করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ --- বিশেষ দক্ষ লোকের দরকার, নইলে শোচনীয় হবে।"[১৪]

২৩ ডিসেম্বর ১৯৩৬ তারিখে এর অভিনয় হয়। এর পরের অভিনয় দেখে কবি মোটের উপর সন্তোষ প্রকাশ করে শিশিরকুমারকে লেখেন-

"...মনে কুণ্ঠা নিয়ে গিয়েছিলেম। সেখান থেকে মনে আনন্দ ও বিস্ময় নিয়ে ফিরে এসেছি। এমন সুসম্পূর্ণপ্রায় অভিনয় সর্বদা দেখা যায় না ...তৎসত্ত্বেও যদি শ্রোতার মনস্তুষ্টি না হয়ে থাকে সেজন্য নাট্যাধিনায়ক শ্রীযুক্ত শিশির ভাদুড়ীকে দোষ দেওয়া যায় না।"[১৫]

Conclusion:

১৯৯০ সালে মঞ্চে উপস্থাপনের জন্যই কবি নাট্যরূপ দিয়েছিলেন রাজর্ষি উপন্যাসের। তিনি যে সময়ে নাট্য চর্চা আরম্ভ করছেন সেটি পেশাদার থিয়েটারের স্বর্ণযুগ। বাংলা মঞ্চের মধ্যগগনে তখন বিরাজ করছেন গিরিশ ঘোষ। সেজন্য প্রথম দিকের 'রাজা ও রানী', 'মালিনী' কিংবা 'গোড়ায় গলদ' সবকটা নাটকে শেক্সপিরীয় গঠন ও প্রত্যক্ষ নাট্যদ্বন্দ্বের উপস্থিতি দেখা যায়, যেটি সেই

সময়ের অন্যতম লক্ষণ। তবে হ্যাঁ প্রযোজনা করতে গিয়ে তিনি এই একেবারে বাস্তবের অনুকরণের কুফল অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। বিসর্জন অভিনয়কালে বাস্তবের অনুকরণ থেকে সরে আসতে না পারলেও এর কিছুদিন পরেই 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন'র পাতায় প্রকাশ পায় কবির 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধটি। সেখানে যে নাট্যভাবনার কথা বললেন তিনি সেটিই ১৯০৮ সালের পর থেকে লেখা একের পর এক নাটকে প্রয়োগ করেন। এই যে বিকল্প এক নাট্যভাবনা, সেটি পেশাদার মঞ্চের সাথে খাপ খায় না তা তিনি ভালো করেই বুঝতেন। আর সেজনাই অভিনয়ের জন্য বেছে নিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন, কলকাতাকে নয়। বৃহত্তর দর্শক সমাজের সাথে তাঁর নাটকের সংযোগ স্থাপিত না হলেও তিনি তাঁর নাটকগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, পৃষ্ঠা- ১৯৮

২) ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, ঘরোয়া, পৃষ্ঠা- ২১

৩) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলি (১৬), পৃষ্ঠা- ৬২৫

৪) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র ১৪, পৃষ্ঠা- ১৮১

৫) সেন ক্ষিতিমোহন, দিনলিপি, দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৪, পৃষ্ঠা- ১৩৮

৬) মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনী (প্রথম খণ্ড), পৃষ্ঠা- ১৫৪

৭) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র ৮, পৃষ্ঠা- ১১৪

৮) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র ৮, পৃষ্ঠা- ৮৮

৯) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র ৮, পৃষ্ঠা- ১৭৬

১০) কর সুধীরচন্দ্র, কবি-কথা, পৃষ্ঠা- ২৯-৩০

১১) দেবী মৈত্রেয়ী, মজুমদার অমিয়কুমার, কবি সার্বভৌম, পৃষ্ঠা- ১৫

১২) দেশ, কলকাতা, ১৬ ভাদ্র, ১৩৬৮, পৃষ্ঠা- ৪০২

১৩) কর সুধীরচন্দ্র, কবি-কথা, পৃষ্ঠা- ৪০

১৪) দেশ, কলকাতা, ১০ আশ্বিন ১৩৮২, পৃষ্ঠা- ৬৫৯

১৫) মিত্র অমল, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নটরাজ শিশিরকুমার, পৃষ্ঠা- ৫৪

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, মাঘ ১৪০৭

২. ঘোষ সুব্রত, বিনাটকের নাট্যকথা, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ২০১৭।

৩. চক্রবর্তী রুদ্রপ্রসাদ, রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ সমকালীন প্রতিক্রিয়া, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৫

৪. চক্রবর্তী রুদ্রপ্রসাদ, সাধারন রঙ্গালয় ও রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৯

৫. চৌধুরী অহীন্দ্র, নিজেরে হারায়ে খুঁজি, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, কলকাতা, ১৯৬২

৬. ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, ঘরোয়া, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৬২

৭. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪১৫

৮. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র নাট্য সংগ্রহ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, মাঘ ১৪০৫

৯. ঠাকুর সত্যেন্দ্রনাথ, আমার বাল্যকাল ও বোম্বাই প্রবাস, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯১৫

১০. পাল প্রশান্তকুমার, রবিজীবনী, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৯৫

১১. মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবন কথা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, আগস্ট ১৯৬১

১২. চট্টোপাধ্যায় ড. সুপর্ণা, রবীন্দ্র-নাট্য আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ, করুণা পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০২

১৩. সেন অশোক, রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা, (১ম খণ্ড), এ. মুখার্জী এন্ড কোং প্রা. লি., কলকাতা, ১৩৬৪

১৪. ভট্টাচার্য শ্রীআশুতোষ, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী এন্ড কোং প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৬১

Citation: **মাইতি দাস. অ.**, (2024) "রবীন্দ্র উপন্যাসের নাট্যরূপায়ন", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-2, Issue-10, November-2024.